Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 8, August - 2026

DOIs:10.2018/SS/202608009 --:-- Research Paper / Article / Review

সন্মাত্রানন্দের নির্বাচিত কবিতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিফলন

দেবশ্রী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email: debasreepaul@bhu.ac.in

সারসংক্ষেপ: সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয়ভাবনার যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা বয়ে চলেছে, বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন সেখানে অন্যতম অনুষঙ্গ। এই বিষয়ভাবনাকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও কাব্যচর্চায় এর প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে কম। সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। তিনি সৃজনশীল রচনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধ, বৌদ্ধদর্শন এবং বুদ্ধানুরাগী বিভিন্ন দার্শনিকের ভাবনাকে নান্দনিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যেও এই বিশেষ ভাবধারার সংযোজন বাংলা কবিতার মূল ধারাটিকে নিঃসন্দেহে আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে তুলেছে। 'দৃশ্যকাব্য' কবিতায় কবি বুদ্ধের অহিংস ধর্মের বিপরীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মের প্রসঙ্গ এনেছেন। অন্যদিকে অসঙ্গ-বসুবন্ধুর 'বিজ্ঞানবাদ' বা চিত্তমাত্রতার ধারণাকে সক্রেটিসের যুক্তিবাদী দর্শনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ত্যাগের এক বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেন। তিব্বতের বহুপ্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম তথা সমাজকে প্রজ্ঞা-করুণার আলোয় উদ্ভাসিত করার যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন বৌদ্ধপণ্ডিত ও দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর তাঁর মহৎ আত্মত্যাগ এবং মহানিষ্ক্রমণের মধ্যে দিয়ে, কবি তা-ই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে তুলে ধরেছেন 'সেই রাত্রি' কবিতায়। এমনকি কবির ভালোবাসার অনুষঙ্গেও স্থান পেয়েছে বৌদ্ধচেতনা। শিরোনামহীন কবিতা ও 'চরণবৈভব' শীর্ষক কবিতায় লৌকিক প্রেম-বিরহ পার্থিব সীমা অতিক্রম করে উচ্চস্তরীয় আত্মিক বা আধ্যাত্মিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার বৌদ্ধ দর্শনের 'মার' বা ছোট আমি-র বিপরীতে 'প্রকৃত আমি' বা বড় আমি'র মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এসেছে 'বিষকল্পকথা' কবিতায়। 'Two Brothers' বা 'দুই ভাই' কবিতায় অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে করুণা ও জ্ঞানের মিলন ঘটেছে। অন্যদিকে 'চুপকথা' কবিতায় বুদ্ধের নীরবতার কারণে কীভাবে তাঁর ধর্মাশ্রিত সংস্কার ক্রমাগত নানান কুসংস্কারে পরিণত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা তৈরি করেছে, তারই ট্র্যাজিক রূপ দেখানো হয়েছে এখানে। এছাড়া 'শিলালেখ' কবিতায় রাজা নয়পালের রাজনৈতিক সংশয় এবং তাঁর ঘোড়াটির উদাসীন বৈপরীত্যের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের কৃত্রিম জটিলতা ও সৃষ্টিশীল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মুক্তভাবনাকে কবি এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সন্মাত্রানন্দের কবিতা নিছক ধর্ম, দর্শন বা ঐতিহাসিক তথ্যের নিগড়ে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সর্বজীবে প্রেম প্রচারের মতন মহৎ ভাবনায় আধুনিক কাব্য সাহিত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

সূচক শব্দ: বাংলা কাব্য-কবিতা, সন্মাত্রানন্দ, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শন

ভূমিকা: বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবহমানধারাটি বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শনের ভাববস্তুর দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ বুদ্ধ, তাঁর দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনানুরাগী দার্শনিকদের নিয়ে নতুন করে ভেবেছেন এবং কবিতায় তাঁদের উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও সমসাময়িক নানা চরিত্রের সহিত সমন্বয় সাধনের মধ্যে দিয়ে। যেখানে রয়েছে সময়কালের এক অনন্য বিন্যাস। যা বাংলার কাব্যপ্রবাহে অহিংসা-করুণা-জ্ঞান ও প্রেমের মতন বৌদ্ধ দর্শনের মূল চেতনাকে গভীরভাবে প্রতিফলিত ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। যার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আমরা তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তুলে ধরবো।

আলোচনা: সন্মাত্রানন্দ তাঁর সাহিত্যে 'সময়কাল' নিয়ে এক প্রকার এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। যেখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ হরাইজেন্টালি অথবা ভার্টিকালি একে অপরকে ছুঁয়ে গেছে। আর চরিত্র ছাড়া এই এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব নয় বলেই তিনি বিভিন্ন সময়কালকে ঐতিহাসিক চরিত্র, সমসাময়িক বা বাস্তব চরিত্র এবং কাল্পনিক চরিত্রদের অনুষঙ্গে উপস্থিত করেছেন এবং বুদ্ধ, বৌদ্ধ দর্শন তথা বুদ্ধানুরাগী দার্শনিকদের ভাববস্তুকে তাঁর কল্পিত কবিমনে জারিত করে কবিতায় চিত্রিত করেছেন। কবিতা আশ্রম থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্রোতোবক্ষে রাখিব মর্মর' (২০২১)। তবে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগে থেকেই কৈশোরকালীন শোভন রায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তথ্যসূত্র অনুসারে জানতে পারি, স্নাতকস্তরে প্রথমবর্ষে পরিসংখ্যান বিষয়ে পাঠরতকালে (১৯৮৮) নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত 'অভীঃ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'দেখো, যেন ভ্রষ্ট না হয়' প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতার মূল ভাবনা ছিল বর্তমানের গর্ভে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভ্রষ্ট হতে না দেওয়া— এই বিষয়টিকে বিড়াল মাতার রূপকের মধ্যে দিয়ে

কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। শোভন রায় ১৯৯৬ সালে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর পূর্বাশ্রম ছেড়ে বেলুড় মঠে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন, নাম হয় সন্মাত্রানন্দ। সন্ন্যাস জীবন নানান বিধিনিষেধের মধ্যে যাপন করতে হয়। আর সেই কারণে দীর্ঘদিন তিনি লেখালিখি থেকেও দূরে ছিলেন।

কালের নিয়মে প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২০০৬ সালে জুলাই মাসে ত্রিপুরার 'প্রান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি কবিতা— 'কোনো এক শিক্ষিকার স্মৃতিকথা'। ঐ বছর সেপ্টেম্বর-এ 'প্রান্তর' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় তাঁর 'দৃশ্যকাব্য' কবিতাটি আত্মপ্রকাশ করে। কবিতাটি রচিত হয়েছে চারটি ঐতিহাসিক দৃশ্য সহযোগে অরণ্যের রহস্যময় পটভূমিতে। কবি এখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চরিত্রদের পৃথক পৃথক চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। আর সেই চরিত্রগুলোর পারস্পরিক ভাবনাগত বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে সন্মাত্রানন্দ মানুষের চিরন্তন জ্ঞানতৃষ্ণা, দর্শন, বিজ্ঞানচেতনা, ক্ষমতা ও ত্যাগের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম দৃশ্যটিতে আমরা দেখতে পাই, 'পাঁচজন মানুষ বৃত্তাকারে বসে আছে আর তাদের কেন্দ্রে ঋজু কাষায় পরিহিত এক শ্রমণ'। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, কেন্দ্রস্থ এই শ্রমণ হলেন তথাগত বুদ্ধ। যাঁকে কেন্দ্র করে বসে আছেন তাঁর পঞ্চশিষ্য। সেখানে তথাগত বলছেন আত্মপ্রেমানুভূতির মধ্যে দিয়ে মানব মনের দুঃখ জয়ের বাণী— 'তুমি যেমন দুঃখ পেতে চাওনা, তেমনি অন্যরাও কেউ দুঃখ চায় না,/ তাই, কাউকে দুঃখ দিও না, আঘাত কোরো না, হিংসা কোরো না···।'[১] বুদ্ধ কর্তৃক অহিংসার এই বাণী প্রচারের সময়, বনের অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল রাজার যথার্থ রাজধর্ম পালনের কথা। সেকথা বলছে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাঁধে থাকা বেতালের শব— '··· রাজধর্মে হিংসা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়,— অবশ্যস্বীকার্য/ সেই কথা বোঝানোর জন্যেই গল্প বলছে বেতাল।'[২] এমন সময় একপ্রকার অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন অয়াড্রু ভেসালিয়াস। ইনি আধুনিক অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার জনক। বিক্রমাদিত্যের কাঁধে থাকা বেতালের শবদেহটিকে ঠাহর করলেন। অথচ মৃতদেহটি যে রাজার সঙ্গে কথা বলছে— একথা তিনি মানতে পারলেন না। এহেন অলৌকিক বিষয়কে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিক্রমাদিত্যকে বললেন, 'মশাই, স্বপ্নের ঘোরে আপনি নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন,/ মৃতদেহ কখনো কথা বলে না,...।' [৩] তাছাড়া ভেসালিয়াস যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটি হল প্রাচীন গ্রিক অ্যানাটমির চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানুষের যকৃতের আকৃতি বিষয়ক প্রচলিত ধারণাটিকে তিনি ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন বিক্রমাদিত্যের কাঁধে থাকা বেতালের শবদেহটির ব্যবচ্ছেদ করে। বিষয়টি হল এইরকম, গ্যালেনের সময় রোমান আইন অনুযায়ী মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ফলে গ্যালেন কখনও মানুষের প্রকৃত অঙ্গসংস্থান সরাসরি দেখার সুযোগ পাননি। তিনি মূলত গবাদিপশু ও বন্যপ্রাণী ব্যবচ্ছেদ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেটাকেই মানুষের শারীরিক গঠন বলে ধরে নিয়েছিলেন। এর ফলে মানুষের হৃদযন্ত্র, যকৃৎ ও রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর তত্ত্বে অসংখ্য ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। যে ভ্রান্তি সকলের প্রত্যক্ষে এনেছিলেন ভেসালিয়াস। তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে সরাসরি মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাতে লাগলেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভুল শুধরে সাধারণের কাছে সেই শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুললেন। এরপর আমরা দেখতে পাই, টিলার ঢালের কাছে দুই ভাই অসঙ্গ ও বসুবন্ধুকে, মহাযান বৌদ্ধদার্শনিকদ্বয় একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করছেন তাঁদের মতবাদ নিয়ে। অসঙ্গ ভাই বসুবন্ধুকে বলছেন, সে নিজে যেমন 'অভিধর্ম- বিভাষা'টি ফলাও করে লিখেছে তেমনই যেন অসঙ্গ-এর মতবাদ যা বৌদ্ধদর্শনে 'বিজ্ঞানবাদ' বা 'চিত্তমাত্রতা' নামে সিদ্ধ সেটিকেও সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেন— 'সবই মন: কল্পিত, সমস্ত জগৎ মনেরই কল্পনা, বাস্তব বলে কিছুই নেই,/ সকলই স্বপ্ন, মনের চিত্রবিচিত্র খেয়াল···।'[৪] সেই সময় মাঠ পেরিয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন কদাকার এক বৃদ্ধ, যিনি অসঙ্গের এই মতবাদের উপর প্রশ্ন তুলে বললেন, 'তবে কি এই হেমলকের কাপটিও আমার কল্পিত ছিলো?' [৫] এই কদাকার বৃদ্ধটি হলেন দার্শনিক সক্রেটিস। কথিত আছে, প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে তরুণদের পথভ্রষ্ট করা এবং দেবতাদের অবমাননা করার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গ্রিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে হেমলক (এক ধরণের প্রাণঘাতী বিষ) পান করে আত্মহনন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আসল বৈপরীত্যটি হল, যে বিষ পান করে সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল– তাকে তো কোনোভাবেই 'মনের কল্পনা' বা 'স্বপ্ন' বলে নস্যাৎ করা যায় না। অন্যদিকে অরণ্যের নিভৃত পরিবেশে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসে পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র মনোযোগ সহকারে তাঁর ভাষ্যের টীকা লিখতেন। তবে যেদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁর শাস্ত্রচর্চার অন্তরায় হয়ে উঠেছিল সেদিন তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন এক নারী। যাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে বাচস্পতি মিশ্র প্রশ্ন করেছিলেন— কে তুমি, নারী? প্রত্যুত্তরে বাচস্পতির নিকট সেই নারী পরিচয় দিলেন, আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী অভাগিনী ভামতী। নিরন্তর জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থেকে যে ব্যক্তিটি ষোলো বছর আগে নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে পর্যন্ত চিনতে পারেন নি; তাঁর স্মৃতিতে তাঁদের বিবাহও যে বিস্মৃতিপ্রায় হয়ে গেছে তা ভামতী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মনে খানিক অভিমান রেখে স্বামীকে স্মরণ করালেন— 'ষোলো বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো, বিয়ের রাত থেকেই/ আপনি ডুবে আছেন পুঁথির মধ্যে, লিখে চলেছেন টীকার পর টীকা—-/ এতো মগ্ন হয়ে আছেন শাস্ত্রচর্চায় যে/ আজই প্রথম কথা হলো, এর আগে—-/ আমার নামও জানতে চাননি কোনোদিন···।'[৬] অতএব জ্ঞানের জন্য বাচস্পতি মিশ্র যেমন পার্থিব জগতকে উপেক্ষা করেছিলেন তেমনই স্বামীর জন্য ভামতী নিজের নারীত্বকে উপেক্ষা করেছিলেন। আর সেই উপেক্ষিত নারীত্বের মূল্য হল— বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী টীকা'। উপেক্ষিত নারীত্বের কারণে যেখানে এতদিন শূন্যতা ছিল, সেই নারীত্ব অর্জনে ভামতী পূর্ণতা পেল।

২০০৭-এর অক্টোবর মাসে 'প্রান্তর' পত্রিকার উৎসব সংখ্যায় কিংবদন্তি বৌদ্ধ দার্শনিক অতীশ দীপংকরের তিব্বত যাত্রার প্রেক্ষাপটে লিখেছেন 'সেই রাত্রি' কবিতাটি। সাহিত্যিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এই কবিতার মধ্যে সুপ্ত ছিল তাঁর ২০১৭ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র মূল ভাবনার বীজ। শতাব্দী প্রাচীন দেওদার বনের অলৌকিক রহস্যময় দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে কবিতাটি। যেখানে অজানা কোনো সংকেত নেই, আছে কেবল আদিম গম্ভীর এক স্তব্ধতা, যার প্রতিফলন মানুষের মনকে করেছে 'চিত্তচঞ্চলতাশূন্য'। আদিম সমাজ চিরকাল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করে এসেছে, অথচ এই চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতা উপাস্য ও উপাসকের মধ্যেকার দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে কবিমনকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে— কে কার এখন আর করে বলো স্তব মন্ত্রপাঠ? সেই মুহূর্তে

কবির মনে পড়ে, সেই রাত্রির কথা 'বিক্রমশীলা থেকে তিব্বতের পথে যে রাত্রে চলে যান একা/ দীপংকর এবং কবি হন তাঁর 'প্রলম্বিত ছায়া সহচর।'[৭] কবি নিজেকে দীপংকরের 'ছায়া সহচর' বলেছেন যে ঘটনা অনুষঙ্গে···সহচর সেই ছায়া, বিনা অবয়বে এক নিমেষে বিলুপ্ত সময়ের ডানায় ভর করে দীপংকরের কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখেন— 'পুঁথির পাতায় ব্যর্থ অন্বেষণ শেষ হয়ে গেলে/ দেখেছি কেমন তিনি বিহারের গবাক্ষ পথে/ স্তম্ভিত অন্ধকারে দীপ্তিমান দুটি চোখ মেলে/ কোন জিজ্ঞাসায় স্থির বিষন্ন গম্ভীর?' [৮] অন্যদিকে তিব্বতের নিকুম্ভিলা থেকে আর্তমানুষদের হাহাকার রোধ করার জন্য আহ্বান এসেছে শ্রীজ্ঞানের কাছে, যে আহ্বান নিয়ে আসে উত্তরের বাতাস। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় রোধ করা এবং সেখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সেখানকার রাজা ও ধর্মপ্রাণ মানুষেরা বহু চেষ্টা ও ত্যাগের মাধ্যমে অতীশ দীপংকরকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে যেমন ছিল মৃত্যুর আকর্ষণ, তেমনই ছিল মৃত্যুর নিশ্চয়তা। তিব্বতের প্রাকৃতিক দুর্গমতা ও সেখানকার যাত্রাপথের ভয়াল রূপই মৃত্যুর এই অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বত যাওয়ার সেই পথটি ছিল মৃত্যুর ফাঁদ। সেটিকে দেখে কবির মনে হয়েছে, 'উদ্যত সাপের ফণা লক্ষমুখে করেছে লেহন'। সাধারণত মানুষ মৃত্যুর মরণফাঁদ দেখলে আতঙ্কিত হয়, কিন্তু দীপংকর সেই মৃত্যুকে 'সপ্রেমে সোল্লাসে' আলিঙ্গন করেছেন। মানব কল্যাণের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগের মাদকতা তাঁর দুই চোখের লালিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিব্বত যাত্রার সেই রাত্রি এতটাই নির্জন স্তব্ধতা মণ্ডিত ছিল যে, 'নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়/ হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনা যায়।'[৯] দীপংকরের তিব্বত যাত্রা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা তাঁর নিঃশব্দে প্রদীপ হাতে নিয়ে হেঁটে চলার দৃশ্য কল্পনা করতে পারি। তবে আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই যাত্রা ছিল তাঁর জীবনের চূড়ান্ত এবং শক্তিশালী একটি সংকল্প যা, 'হাজার হাজার ঘোড়ার খুরে পাথরের প্রতিঘাতে/ ঠিকরে উঠেছে বিদ্যুৎ,...।'[১০] ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পাল রাজবংশের অবদান অনস্বীকার্য; যার মধ্যে মহীপাল ও নয়পাল ভূমিকা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা কালের মহীগর্ভে সমাহিত হওয়ার পর আস্থা টিকে ছিল শুধুমাত্র দীপংকর শ্রীজ্ঞানের উপর। তাই দীপংকরের তিব্বতে চলে যাওয়া বৌদ্ধসংঘ ও বৌদ্ধদর্শনের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তার অনুমান করেছেন কবি —"দীপংকর চলে গেলে ভারতের চৈত্য বিহার আর স্তূপ/ অন্ধকার হয়ে যাবে, দীপংকর চলে গেলে সব সঙ্ঘারাম হবে/ ধুলায় মলিন, দীপংকর চলে গেলে আর কোনোদিন / শ্রমণেরা বসাবে না বিতর্কবাসর, সূত্র, ধর্ম, প্রতিমোক্ষপাঠ/ জলাঞ্জলি পাবে, দীপংকর চলে গেলে কে যোগাবে আমাদের/ চীবর কাষায়? দীপংকর চলে গেলে শেষ দীপ নিভে যাবে হায়!" [১১] এতদ সত্ত্বে দীপংকর শ্রীজ্ঞান স্মৃতিভেজা অশ্রু মুছে, নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে মধ্যরাত্রে তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগ নেই, 'প্রতিস্পর্ধী ড্রাগনের ব্যদিত আনন' সেখানে প্রতিকূল শক্তির প্রতীক, ধর্মের নামে সেখানে কুসংস্কার চলে ও তান্ত্রিকতার অপব্যবহার করা হয়, হিংসা এবং 'মহানরমেধ'-এর মত নৃশংসতা চলে, সেখানে সমাজজুড়ে শুধু ভোগলিপ্সা ও আদিম কামনাবাসনার এক বিকৃত পরিবেশ— এই পরিস্থিতিতে তিব্বতের সাধারণ 'মানুষ আজ ভালো নেই'। নরকসদৃশ তিব্বতের এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বুদ্ধের সর্বজনীন প্রেমের পরীক্ষা দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, বৌদ্ধধর্ম ও করুণা বাস্তবিক সমাজ-মানুষের জীবনে কার্যকারী কিনা। সঙ্ঘের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে তা জানা সম্ভব নয়— দীপংকর চললেন তাই তিব্বতে।

'ঘষা পয়সা' যেমন তার উজ্জ্বলতা ও মূল্য হারিয়ে সমাজ থেকে বাতিল হয়ে যায় তেমনই তাদের বেঁচে থাকাটা কোনো সার্থকতা বয়ে আনে না, বরং তা যেন কেবলই 'মরণের অপচয়' মাত্র। তারা এতটাই অভাগা যে ঋতুর সৌন্দর্য কিংবা জীবনের কোনো মধুর 'স্মৃতি' নিজেদের হৃদয়ে লালন করার সুযোগ পায়নি। তারা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেনি; সমাজ ও নিয়তির সামনে চিরকাল 'নতজানু' হয়ে কেবল বাঁচার জন্য জীবন ভিক্ষা করেছে। আজীবন এই চরম অবহেলা ও যন্ত্রণার পর, অতীশ দীপংকরের সেই মহানিষ্ক্রমণের রাতে এই প্রান্তিক মানুষগুলো ঈশ্বরের কাছে নিজেদের জীবন সমর্পণ বা 'সংহরণ' করার প্রার্থনা জানিয়েছিল। অন্যদিকে সমগ্র তিব্বত জুড়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিকৃত তান্ত্রিকতার কারণে 'বলিভুক' বা রক্তপিপাসু দেবতার সন্তুষ্টির নামে নরবলি দেওয়া হত, সেখানে খড়্গাঘাত পড়ত সেইসব নিরীহ, নিরপরাধ ও অসহায় মানুষের উপর। অন্যায়ভাবে নিহত হওয়া সেইসব মানুষদের কর্তিত মুণ্ডগুলি শূন্যপথে ঘুরে ঘুরে কাতরস্বরে আর্তনাদ করে বলছে— 'রক্ষা করো, রক্ষা করো'। সেই আর্তনাদ শুনে '... এক গাঢ় মধ্যরাতে/ বিক্রমশীলার থেকে তিব্বতের পথে চলে যান করুণায়/ একা দীপংকর,/ নির্জন প্রদীপ হাতে, কুয়াশা ও পুরাবৃত্ত অন্ধকার/ দু'পাশে সরিয়ে,...।'[১২] সেই রাত্রে প্রকৃতিকেও ম্লান বিষন্ন লাগছিল কারণ আকাশের চাঁদও সেদিন তার সহজ স্বাভাবিক দীপ্তি ও হাসি হারিয়ে ফেলেছিল। অবশেষে কবি যে কিনা দীপংকরের 'ছায়া সহচর' ছিল, আজ তিনি বর্তমানে ফিরে এসেছেন এবং মহৎ ত্যাগের সেই রাত্রিটিকে স্তবকে স্তবকে পাঠ করে চলেছেন। আর তা 'শোনে শুধু নিঃশ্বসিত অন্ধকারে পাইনের বন'। কবিতার শেষে সেই চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতা পুনরায় ফিরে এসেছে, লৌকিক-অলৌকিক ভেদাভেদকে মিটিয়ে ত্যাগের সেই মহৎ আদর্শকে স্মরণে রাখতে চেয়ে।

পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি সন্মাত্রানন্দ তাঁর Sanmatrananda Sovon নামের ফেসবুক পেজেও কবিতা লিখতে শুরু করলেন। আর সেখানে ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পোস্ট করেন শিরোনামহীন একটি কবিতা, যার প্রথম লাইনটি হল 'শহরের শেষে বুদ্ধের মন্দির'। আলোচ্য কবিতাটি মূলত দু'টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রথমজন, কবি স্বয়ং যাঁর প্রেমিকসত্তার প্রকাশ কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে এবং দ্বিতীয়জন, বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত ও কবির অলব্ধ প্রেয়সী, কবির কাছে তিনি 'নীলাঞ্জনা'। তবে আরেকজনের নীরব উল্লেখ কবিতাটিতে আছে— শান্ত সমাহিত বুদ্ধ বা তথাগত। গোধূলিকালীন শহরের প্রান্তে অবস্থিত বুদ্ধ মন্দিরে প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল কবির। কারণ নিয়ম করেই তার প্রেয়সী বুদ্ধ মন্দিরে আসেন। এবং সঙ্গে করে তার প্রভুর চরণে নিবেদনের জন্য নৈবেদ্য নিয়ে এসেছেন। তার পরনে ছিল ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি। যখন তিনি বুদ্ধের উপাসনায় সম্বৃত, তখন কবি ছিলেন— '... বিভোর বিভাবে তোমাতে সমর্পিত।'[১৩] মোমের মত সময়ের ক্ষয় হয়, অথচ বুদ্ধের চরণে মগ্ন প্রেমিকার ধ্যান তখনও ভাঙে না। এই দৃশ্য দেখে প্রেমিক কবি একবার প্রেয়সীর প্রতি অভিমান করে বলেন, 'আমি যে বকুল— অভিমান হয়ে ঝ'রি।'[১৪] আবার তিনি বুদ্ধের প্রতি ক্ষোভ উদ্গীরণ করে বলেন, 'আমার দুঃখ বুঝেছ কি, তথাগত?/ এই মেয়ে শুধু তোমাকেই

চেয়ে দেখো।'[১৫] যে দুঃখ-নিরোধের জন্য সিদ্ধার্থ নিরন্তর সাধনা করে 'বুদ্ধ' হয়ে উঠেছেন, সেই দুঃখে আজ কবি নিমজ্জিত। তবুও এই দুঃখ নিয়ে কবি তাঁর প্রেয়সীকে বুকের মধ্যে আগলে রাখতে চান, ঠিক যেভাবে 'চরণবৈভব' কবিতায় বধূটি অলব্ধ প্রেমের (শ্রমণ) উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— 'আমি শুধু নীল হবো প্রিয় যাতনায়,...।'[১৬] অবশেষে তারা দুজন পাশাপাশি হেঁটে মন্দির প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু কবির নীলাম্বরী তাঁর ভালোবাসা গ্রহণ করলেন না। তাই কবি-হৃদয়ের অশ্রু নিভৃত শিশিরের মতন ঝরে পড়ে এবং তিনি মনের গভীর থেকে তীব্র আক্ষেপের সুরে বলেন— "বলা হল না তো কানে কানে মৃদু স্বরে / দিয়েছি যে নাম, তোমাকে— 'নীলাঞ্জনা'।" [১৭] প্রেয়সীর 'নীলাঞ্জনা' নামটি এখানে বেশ তাৎপর্যবহ; যিনি নীল-অঞ্জন পরিহিতা অর্থাৎ যিনি চোখে বেদনা-ত্যাগ-বিরহ-মৃত্যুকে কাজলের মতন করে পরে আছেন– সেই নারী তো জাগতিক সকল বিষয়ের উর্ধে। তাকে জাগতিক কোনো মায়া-মোহ-ভালোবাসা দিয়ে বন্দী করতে পারবেন না বলেই, সেই মুক্ত নারীকে নিজের মনের মণিমঞ্জুষায় স্থান দিয়ে কবিও আসলে পার্থিব প্রেম-চেতনা থেকে অপার্থিব আধ্যাত্মিক-চেতনায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। কবির ভাবনার রসে জারিত এই চরিত্রগুলো তাই কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভিক্ষু শ্রমণ ও এক গৃহবধূ চরিত্রের সহাবস্থান দেখতে পায় 'চরণবৈভব' কবিতায়। কবিতাটি সন্মাত্রানন্দ তাঁর ফেসবুকে পোস্ট করেছেন ৯ ডিসেম্বর ২০১৩ । কবিতার কথক একজন নারী, সমাজে যার পরিচয় একজন গৃহবধূ রূপে, কিন্তু সে ভালোবাসে এক শ্রমণকে। শীলব্রত পালিত ও গৈরিক কাষায় ভূষিত সেই শ্রমণ বৈরাগ্য ও ত্যাগের জীবন্ত প্রতীক। সংসারের প্রতি অনাসক্তির কারণে তিনি সহজে সকলের সকাশে আসেন না। তাই কবি বলেছেন— 'পূব- বাতায়নে এলে ভোরের শ্রমণ!'[১৮] সূর্যকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু বাতায়নে যখন ভোরের প্রথম আলো এসে পড়ে, তখনই বোঝা যায় সূর্যের উদয় হয়েছে। ঠিক তেমনই, শান্ত-স্নিগ্ধ ভোরের আলো যখন গৃহের পূর্বদিকের জানালায় এসে পড়ে, তখন সেই গৃহবধূ বুঝতে পারে— তার কাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটির আগমন ঘটেছে। তবে বধূটির ভালবাসা শ্রমণের ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতি ছিল না, তা ছিল কেবলই মানুষটির প্রতি। সেকথা অকপটে স্বীকার করেছে— 'আমি নারী, মুগ্ধা নারী/ তোমাকে মানুষ ভেবে ভালোটি বেসেছি।'[১৯] সারা রাত ধরে শিশিরে জলে ভিজে সেই নারী নিজের মন-মুকুরকে পরম যত্নে নির্মল করে তুলেছে, কেবল এই আশা নিয়ে, 'যদি ওই মুখরেখা ছায়া রেখে যায়।'[২০] যদিও সে জানে শ্রমণ কোনোদিনও তার এই ভালোবাসার কথা জানতে পারবে না, আর বধূটিও তাকে জানাবে না। সকলের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে অলব্ধ সেই প্রেমকে বধূটি তার একটি মাত্র ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবে— 'আমি শুধু নীল হবো প্রিয় যাতনায়,' [২১] এই যাতনায় নীল হওয়ার মধ্যে একদিকে যেমন আছে বিরহ-বেদনা, তেমনই রয়েছে নীল অনন্তে সমাহিত হওয়ার সুপ্ত বাসনা। এই অনুভূতি তাকে জাগতিক 'প্রেম চেতনা' থেকে 'আধ্যাত্মিক চেতনা'-র দিকে নিয়ে যাবে সেই পথ দিয়ে— 'যে পথে পড়েছে, প্রিয়, পদচিহ্ন– চরণবৈভব।'[২২]

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র অপ্রকাশিত আখ্যাপত্রটি 'আখ্যাপত্র' শিরোনামে ২৯ আগস্ট ২০২০-তে সন্মাত্রানন্দ তাঁর ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন; যেখানে অতীশ দীপংকর ও চাগ লোচাবার মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি জাহ্নবী এবং অমিতায়ুধের মতো কাল্পনিক চরিত্রদের সহাবস্থান দেখা যায়। সন্মাত্রানন্দের 'আখ্যাপত্র' কবিতাটি তাঁর প্রথম আয়তোপন্যাস 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র এক কাব্যিক ভূমিকা বা পুষ্পিকা। একজন সচেতন সাহিত্যিক হওয়ার কারণে কবিতার শুরুতেই কবি নির্দেশ দিয়েছেন, 'থামুক কুৎসিত ক্রীড়া আন্তরজালিক,/ কবিতার ভানে শব্দমৃগয়াজীবিতা!' [২৩] অর্থাৎ আজকের সাহিত্যিকরা কবিতার নামে একপ্রকার শব্দ-শিকার করছেন। তারা নিজেদের মৌলিক রচনার পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে শব্দ ধার করে জীবন ধারণ করছেন। তাদের এই মেকি কাব্যচর্চা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, 'অবসর আছে, বলো, কবিতা লেখার?' [২৪] আজকের মানুষের কাছে সত্যিই কবিতা লেখার কোনো অবসর নেই–এই নির্মম সত্যটি যেমন অন্য সবার জন্য প্রযোজ্য, তেমনি কবির নিজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। এই আত্মসংশয় ও অনুশোচনা থেকে কবি নিজের উদ্দেশ্য সকলের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, '... আমাকে কি কবিতা মানায়?' [২৫] এইভাবে কবি কাব্যজগতের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা শুনিয়ে পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করে আবার পরমুহূর্তে সান্ত্বনার বাণী আওড়ে দুঃসাহসিক ভঙ্গিতে গর্জে উঠলেন, 'গদ্যের ধুরমুস দিয়ে কাব্যের ললিত/ ভেঙে করব সমতল, মোহমুদগর।/ শাণিত ধারালো বাক্যে প্রাণের শাবক/ বিদ্ধ হলে কাঁদে কোন আর্তির ভাষায়;'[২৬] অর্থাৎ হাতুড়ির মতন গদ্যকে তিনি গড়বেন এবং তা দিয়ে কাব্যের ললিত কলার উপর এমন আঘাত হানবেন যে তা ভেঙে সমতল ও মোহমুক্ত হবে। কাব্যের সঙ্গে এরকম আচরণ করার প্রয়োজনটা কী? এর উত্তর আসে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে– ধরা যাক, কারোর শাণিত বাক্যে আমরা কষ্ট পেলাম অথচ সেই কষ্টের স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ না করতে পারলে আমাদের মানসিক শান্তি হয় না। এই পরিস্থিতিতে আমরা কার কাছে যাবো? অবশ্যই গদ্যের কাছে। আর সেই কারণে কবি তাঁর সাহিত্যভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন গদ্যে; লিখেছেন 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র মতন একটি বৃহৎ উপন্যাস। যার প্রেক্ষাপট জানতে হলে সময়কে লুপ্ত করে দিয়ে 'যেতে হবে বহুদূরে এগারো শতক,/ বজ্রযোগিনী গ্রাম তথা শ্যামদ্বীপ,/ বিক্রমশিলার থেকে তিব্বতের পথ···।'[২৭] যেখানে গিয়ে আমরা বাঙালির গর্ব অতীশ দীপংকর বা তিব্বতী জোবোজের চরণসন্ধান করতে পারি অর্থাৎ যে পথে হেঁটে তিনি বিক্রমশীল বিহার থেকে তিব্বতে পৌঁছেছিলেন। পাঠোদ্ধার করতে পারি 'ড্রাগনের ছবি আঁকা কাষ্ঠপেটিকায় রক্ষিত প্রাচীন পুথি'র। জানতে পারি অতীশের সময়কাল থেকে দু'শ বছর পরে, তিব্বতী লামা চাগ লোচাবা কোন অভিপ্রায়ে নালন্দায় প্রব্রজ্যায় এসে বাঙালি এক বধূর প্রেমে মজেছিলেন? আর সেখানে সন্ধান করি উত্তরের যেখানে প্রশ্ন ছিল, একবিংশ শতকের তরুণ প্রাণ যুবক গবেষক অমিতায়ুধের চোখে চোখ রেখে অনাবিল দৃষ্টিতে কাকে খুঁজেছিল কৃষক-কন্যা জাহ্নবী? উপন্যাসের অন্তর্গত এই সকল ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্ররা তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে– যা আসলেই লেখক মনের যথার্থ প্রতিফলন।

এরপর, ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ও ফেসবুক দু'টি স্থানে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিষকল্পকথা' কবিতাটি, যা গড়ে উঠেছে বিষপুরুষ নামক এক কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। কবিতাটিতে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার আড়ালে এক গভীর জীবন দর্শন রয়েছে। কবিতাটিতে স্বয়ং কবি এবং বিষপুরুষ— এই চরিত্র দু'টির পরোক্ষে আমরাই কিন্তু অখণ্ড রূপে বিরাজ করে আছি। এই 'বিষপুরুষ', যাকে আমরা কথাসাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দের উপন্যাস 'তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি'-তে

'মার' বলে চিনেছি; বৌদ্ধদর্শনে সেই 'মার'-কে আবার 'Evil of God' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে বলতে পারি, এই 'বিষপুরুষ' হল 'বড় আমি'র বিপরীতে 'ছোট আমি'র সহাবস্থান। প্রকৃত অর্থে আমাদের জীবনে 'বড় আমি' বৃহত্বের মার্গদর্শী, অন্যদিকে 'মার বা ছোট আমি' ক্ষুদ্রত্বের মার্গদর্শী। দ্বিতীয়জন, প্রথমজনকে এগোতে দেয় না; ছলে-বলে-কৌশলে তার সম্মুখে নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাই বিষপুরুষ-এর উদ্দেশ্যে কবি সন্মাত্রানন্দ বলেছেন, '...তোমার দংষ্ট্রায় বিষ। ঘনিষ্ঠ হয়ে/ সমস্ত তথ্য তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে/ আমাকে হত্যা করবে বলে আমাকে/ আমন্ত্রণ জানিয়েছ।'(২৮) ঠিক যেভাবে সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধ হয়ে ওঠার যাত্রাপথে, 'মার' বারবার তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে চেয়েছিল, বিষপুরুষও একইভাবে কবির মধ্যে তার নিজের বিষ ঢালতে চেয়েছিল। সেই বিষপুরুষ যে কোনো অন্নপূর্ণা বা কোনো শুদ্ধোদন নয়– তা নিশ্চিত জেনেছেন বলেই কবি সাহসের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছেন, 'প্রতিদিন একটু একটু করে বিষ খেয়ে/ নিজেকে তৈরি করেছি আমি,/ এখন তোমার যাবতীয় বিষ/ তুমি ঢালতে পারো;/ আমার কিচ্ছু হবে না।'(২৯) কবির সারা শরীর আশিরনখর বিষ, যে দংশন করবে সেই মরবে। এমনকি বিষপুরুষকেও তিনি ছাড়বেন না। বিষপুরুষ তার হিংস্র কর্মের জন্য যথপোযুক্ত সাজা যে পাবে সেকথাও তাকে জানিয়েছেন কবি— '...আমার বিষ তোমাকে / শুধু মেরে ফেলেই নিষ্ক্রিয় হবে না,/ এই বিষ থেকে পুনর্জন্ম হবে তোমার—/ সেই জন্মে তোমার এ জন্মের স্মৃতি/ অটুট থাকবে, সে- জন্মে/ সমস্ত জীবন ধরে/ তোমাকে দগ্ধ করবে এই ভয়াবহ বিষকল্পকথা।'(৩০) অতএব এই 'বিষকল্পকথা' আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে জড়িত। যা ক্রমশ আমার 'আমিত্ব'-কে গ্রাস করে ফেলে, দংশনে নষ্ট করে দেয়ে। সেই বিষকে, নিজের অমৃতরসে জাড়িত করে তাকে নির্মূল করে ফেলায় 'বিষকল্পকথা' কবিতার মূল উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ- বসুবন্ধুকে নিয়ে লেখা একটি ইংরেজি কবিতা 'Two Brothers' বা বাংলায় 'দুই ভাই' নামের কবিতাটি ফেসবুকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ পোস্ট করেছিলেন কবি সন্মাত্রানন্দ। বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রভাবশালী দুই সহোদর ভ্রাতা এবং পণ্ডিত—আসঙ্গ এবং বসুবন্ধু-এর আধ্যাত্মিক তথা মানসিক উত্তরণের আখ্যান কবিতাটির মূল ভাববস্তু। একই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় সন্মাত্রানন্দের 'ভামতী অশ্রুমতী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অশ্রুমতী' গল্পেও। যেখানে দার্শনিক দুই ভ্রাতার আজীবন সত্যানুসন্ধান এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন মাহাত্ম্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে। কবিতার প্রথমাংশে আসঙ্গের সত্যানুসন্ধানের কথা বলতে গিয়ে কবি তাঁর ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তবে সফল হওয়ার সাংকেতিক নির্দেশ তাঁর আশেপাশে প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানের মধ্যে ছিল, যা খুঁজে পেতে দেখলেন—'He learnt endeavor from a mountain bird, Persevarance from the droplets of water,/ Hope from an iron-smith.' (৩১) (বঙ্গানুবাদ-'সে একটি পাহাড়ি পাখির কাছ থেকে প্রচেষ্টা শিখেছে,/ জলের ফোঁটার কাছ থেকে অধ্যাবসায়,/ একজন লোহার স্মিথ থেকে আশা।') সম্মিলিত এই সাংকেতিক শিক্ষা আসঙ্গ চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছে; একটি যন্ত্রণাকাতর ক্ষত-বিক্ষত কুকুরের প্রতি তীব্র প্রেমানুভবের মধ্যে দিয়ে। পরম করুণার এই দৃষ্টান্ত বৌদ্ধদর্শনে 'বোধিসত্ত্ব' অভিধায় উন্নীত— আসঙ্গ 'বোধিসত্ত্ব' লাভ করলেন।

কবিতার দ্বিতীয়াংশে অপর ভ্রাতা বসুবন্ধু সত্যানুসন্ধানের পাশাপাশি ভ্রাতা আসঙ্গের খোঁজে আজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ও প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলেই জ্ঞানমার্গে সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বসুবন্ধু ভেবেছিলেন তাঁর ভাই হয়তো অরণ্যে হারিয়ে গেছেন বা সাধনায় লীন হয়ে গেছেন। অথচ ভাইকে পাওয়ার আশা তিনি ছাড়েন নি— 'He searched his lost brother/ In age-old manuscripts, in heated arguments,/ In fiery ordeal. …'(৩২) (বঙ্গানুবাদ-'সে তার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজছে / বয়সের পাণ্ডুলিপিতে, উত্তপ্ত তর্কে,/ অগ্নিগর্ভ সংক্রমণে।…' অন্যদিকে তিনি জ্ঞানচর্চায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তাঁর জীবন বইয়ের ফ্যাকাশে পৃষ্ঠার মতো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জীবনের অর্থকে প্রায় শূন্য বলে মনে করছেন, তখন 'He met his brother Asanga, his Master/ In a deep forest, shining as resplendent Sun;…' (৩৩) (বঙ্গানুবাদ- 'সে তার ভাই আসাঙ্গার সাথে দেখা করেছে, তার মাস্টার/ একটি গভীর বনে, উজ্জ্বল সূর্যের মত;।') শেষপর্যন্ত বাসুবন্ধুর শুষ্ক-বিবর্ণ জ্ঞান যখন পরম করুণার আলোর (আসঙ্গ) মুখোমুখি হল, তখনই তিনি জীবনের প্রকৃত অর্থ বা পরম সত্যের মুখোমুখি হলেন। অতএব দুই ভাইয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সত্যানুসন্ধানের দু'টি পথ (করুণা ও জ্ঞান) 'এক' হয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ ফেসবুকে পোস্ট করা 'চুপকথা' কবিতাটি সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রত্যক্ষরূপে কবিতাটিতে বুদ্ধের নীরবতাকে তুলে ধরা হলেও, পরোক্ষে এর অন্তরালে গভীর ট্র্যাজেডি রয়েছে। বুদ্ধ চুপ ছিলেন একথা ভেবে যে, '...কথা বললে সমস্যা।/ কথা থেকে ধারণার জন্ম হবে।/ আর কে না জানে,/ বস্তু আর বস্তুর ধারণা এক নয়।'(৩৪) আবার তাঁর এই নৈঃশব্দ্যও অনেক বেশি শক্তিশালী। জনমানসে বুদ্ধের এই নৈঃশব্দ্যতার কারণ অনুধাবনের কৌতুহল নিবারণবশত হাজার হাজার গ্রন্থ যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই সেই গ্রন্থের উপর হাজার হাজার ব্যাখ্যা ও টীকা-ভাষ্যও লেখা হয়েছে। এত এত ব্যাখ্যার ফলে বুদ্ধের মাথার উষ্ণীষের চূড়া এতটাই উঁচু হল যে, সাত ক্রোশ দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে, তাঁর নিকটে আসতে, সাধারণ মানুষ ভয় পেতে লাগলেন। যার ফলস্বরূপ দেখা গেল, 'ওদের টেনে আনতে আপনার নীরবতাকে ঘিরে/ গড়ে উঠলো মন্দির, ফলক, লেখমালা,/ মূর্তি, পূজা, ব্রত, প্রথা, পদ্ধতি, উৎসব…।'(৩৫) আর এইভাবে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হতে লাগল এবং তিনি যা যা চান নি, সেগুলো জনমানসে গ্রাহ্য হতে লাগল যেমন করে 'সেই সাবেক কথাসার দর্শন,/ সেই সাবেক পূজাসার প্রতিষ্ঠান।'(৩৬) দীর্ঘদিন যাবৎ কবি এইসব দেখে, নিজের উপলব্ধি বুদ্ধের নিকট নিবেদন করলেন– 'এমন হবে আগে জানলে/ কী জানি কেন আমার মনে হয়:/ আপনি চুপ না থেকে কথা বলতেন,/ ব্যাখ্যা করে বলতেন, কেন আপনার নাম সিদ্ধার্থ,/ কেন আপনি তথাগত গৌতম।'(৩৭) যে বুদ্ধকে নীরবতার ভাবমূর্তি বলা হয়, সেই নীরবতা যেন বুদ্ধ ও তাঁর ভাবনাকে প্রতিনিয়ত বিকৃত করে তুলেছে। তাই আদর্শ ও বিকৃতের দ্বন্দ্বমূলক সহাবস্থান রয়েছে 'বুদ্ধের নীরবতা'র মধ্যে।

সন্মাত্রানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্রোতোবক্ষে রাখিব মর্মর'-এর অন্তর্গত 'শিলালেখ' কবিতাটির ভাববস্তু অবলম্বনে দুটি প্রধান চরিত্রকে আমরা পেয়েছি— খ্রিস্টিয় দশম-একাদশ শতকের পালরাজা নয়পাল (সবাক চরিত্র) এবং তাঁর ঘোড়া (নির্বাক চরিত্র)। তাছাড়া এদের সমান্তরালে অতীশ দীপংকর, যবন সৈন্য এবং চেতনালব্ধ মৃত্তিকাও চরিত্র হয়ে উঠেছে। নৃপতি মহীপালের পুত্র নয়পাল বলিষ্ঠ দাম্ভিক এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধপুরুষ। তাঁর হাতেই রাজ্যশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত। রাজা নয়পাল অতীশের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাই সঠিকরূপে রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত শ্রীজ্ঞান তাঁকে নেপালের পাল্লা থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন— 'কয়েকটি মুহূর্ত আগে অর্থাৎ মাত্র সাড়ে নয়শো বছর আগে দুপুরবেলায়···।'(৩৮) সেই চিঠিতে অতীশ লিখেছেন— '... যদিও কনৌজরাজ কর্ণদেব এখন তাঁর বৈবাহিক,/ তবু শত্রুতার আর ঈর্ষার বীজ বড়ো গোপন, প্রায় বোধিচিত্তের মতই নিগূঢ়। তরবারি,/ আর জিহ্বা সংযত না রাখতে পারলেই অনর্থ।···'(৩৯) রাজকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত অতীশের এই উপদেশ নয়পালকে এক নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই উপদেশগুলো রাজার কানে 'বসন্তের কোকিলকূজন' বা 'বর্ষার কেকাধ্বনি'র মতন মধুর শোনায়নি, কিন্তু অমোঘ ঔষধ তিক্ত হয়— এই সত্য উপলব্ধি করেই তিনি রাজ্যের কল্যাণে সেটিকে সেবন করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে রাজা নয়পাল তাঁর শুভাকাঙ্খী অতীশ-এর সঙ্গে পত্র মারফৎ বার্তালাভ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যলাভের অবদমিত ইচ্ছাকে ভাবনাপ্রসূ করে তুললেন নিজের একাকীত্বে, নির্জনে ও নিভৃতে— 'অবশেষে গবাক্ষপথে শূন্য চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে/ ···সেই নেপাল আর তিব্বতের পথ, যে পথে অতীশ গিয়েছেন....।'(৪০)

রাজা নয়পাল যেখানে সময় ও রাজনীতির জটিলতায় আবদ্ধ, সেখানে তাঁর ঘোড়াটি সময়হীন এক মুক্ত চেতনার প্রতীক। তাই সাড়ে নয়শো বছর আগের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, চন্দ্রবংশীয় রাজার আগমন সত্ত্বেও পালরাজাদের কর প্রদান, সুদূর তিব্বত থেকে অতীশ প্রেরিত তারাদেবীর মূর্তি-স্থাপনা উপলক্ষ্যে বজ্রাসনবিহারে আনন্দ-উৎসব কিংবা পশ্চিম ভারতে যবন সৈন্যদের আগমনের কোনো কথাই ঘোড়াটি জানে না। অথচ যবনদের অশ্বক্ষুরের শব্দ শুনে চেতনালব্ধ মৃত্তিকা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে, 'কয়েক মুহূর্ত পরেই তাকে কতদূর রক্তাক্ত হতে হবে···' (৪১) কিন্তু উদাসীন সেই ঘোড়ার কোনও ভাবনা নেই। কালচেতনা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, অশ্বারোহী তার জিন ধরে টানে নি, নিজের অস্তিত্ব সংকটের কোনো পরোয়া সে করে না– 'সে শুধু উদাস মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের/ কলাগাঁ-র মাঠঘাট, নদীতীর, চৌধুরীপাড়া আর আমবাগানের ভিতর.....' (৪২) মুখ্যত কবিতাটিতে নয়পালের সন্দেহজনক সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং তাঁর ঘোড়াটির উদাসীন বৈপরীত্যের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের কৃত্রিম জটিলতা ও সৃষ্টিশীল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মুক্তভাবনাকে কবি এই চরিত্রদের আলোকে ব্যক্ত করেছেন।

উপসংহার: সন্মাত্রানন্দের কবিতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন শুধুমাত্র ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা হয়ে উঠেছে মানবজীবনের চিরন্তন দুঃখ, বিরহ, প্রেম থেকে মুক্তির এক জীবন্ত দলিল। বাংলা কবিতার মূল ধারায় বুদ্ধ ও তাঁর দর্শনের প্রথাগত আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম করে সর্বজীবে প্রেমের এই মহৎ ভাবনা, আধুনিক কাব্য সাহিত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বিধান পাল (সম্পাদক), 'প্রান্তর' পত্রিকা, আগরতলা ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, শারদ সংখ্যা ২০০৬, পৃ: ৬৪-৬৫
২) তদেব
৩) তদেব
৪) তদেব
৫) তদেব
৬) তদেব
৭) বিজয় পাল (সম্পাদক), 'প্রান্তর' পত্রিকা, আগরতলা ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর উৎসব সংখ্যা ২০০৭, পৃষ্ঠা-৫০-৫১
৮) তদেব
৯) তদেব
১০) তদেব
১১) তদেব
১২) সন্মাত্রানন্দ, 'শিরোনামহীন কবিতা' (প্রথম লাইন-শহরের শেষে বুদ্ধের মন্দির), Sovon Roy Sanmatrananda facebook post, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
https://www.facebook.com/ebarekantoi.sovon/posts/pfbid023vYbtEsKQn9fKzDRQ7ksGKyD3HtTmCQrELs19TA9ShLC2Wd2uQteyof6HcyDtxYLl
১৩) তদেব
১৪) তদেব
১৫) তদেব
১৬) সন্মাত্রানন্দ, 'চরণবৈভব', Sanmatrananda Sovon facebook post, ৯ ডিসেম্বর ২০১৩
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378368125632796&set=pb.100003788360448.-2207520000&type=3
১৭) সন্মাত্রানন্দ, 'শিরোনামহীন কবিতা' (প্রথম লাইন-শহরের শেষে বুদ্ধের মন্দির), Sovon Roy Sanmatrananda facebook post, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
https://www.facebook.com/ebarekantoi.sovon/posts/pfbid023vYbtEsKQn9fKzDRQ7ksGKyD3HtTmCQrELs19TA9ShLC2Wd2uQteyof6HcyDtxYLl
১৮) সন্মাত্রানন্দ, 'চরণবৈভব', Sanmatrananda Sovon facebook post, ৯ ডিসেম্বর ২০১৩
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378368125632796&set=pb.100003788360448.-2207520000&type=3

১৯) তদেব
২০) তদেব
২১) তদেব
২২) তদেব
২৩) সন্মাত্রানন্দ, 'আখ্যাপত্র', Sanmatrananda Sovon facebook post, ২৯ আগস্ট ২০২০ https://www.facebook.com/share/p/1KKT7J2wi8/
২৪) তদেব
২৫) তদেব
২৬) তদেব
২৭) তদেব
২৮) সন্মাত্রানন্দ, 'বিষকল্পকথা', Sanmatrananda Sovon facebook post, ৮ জানুয়ারি ২০২৩
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2821420707994180&set=pb.100003788360448.-2207520000&type=3
২৯) তদেব
৩০) তদেব
৩১) সন্মাত্রানন্দ, 'Two Brothers', Sanmatrananda Sovon facebook post, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
https://www.facebook.com/sovon.maharaj/posts/pfbid02LUB6b5ixzfDFWPioaQtqVGigWGNTpB9peaQJ7RZyRvFtwgJzrAXnkw3cHnAGrQ5rl
৩২) তদেব
৩৩) তদেব
৩৪) সন্মাত্রানন্দ, 'চুপকথা', Sanmatrananda Sovon facebook post, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ https://www.facebook.com/share/p/1CBXntgrvf/
৩৫) তদেব
৩৬) তদেব
৩৭) তদেব
৩৮) সন্মাত্রানন্দ, 'স্রোতোবক্ষে রাখিব মর্মর', কবিতা আশ্রম, বনগাঁ উত্তর ২৪ পরগণা ৭৪৩২৩৫, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২, পৃ:১৫
৩৯) তদেব
৪০) তদেব
৪১) তদেব
৪২) তদেব